শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

3297

শূন্য ?

(প্রথম খণ্ড)

PRESENTED

97/320

শ্রীশ্রী বালকব্রহ্মচারীর
বাণী-সংগ্রহ
Asaram

শ্রীশ্রীবালকব্রহ্মচারীর উপদেশ-সংগ্রহের

অন্যান্য গ্রন্থ

১। শ্রীবীরেন্দ্রবাণী (প্রথম খণ্ড)
২। নির্দ্দেশ (প্রথম খণ্ড)
৩। তত্ত্বসার (প্রথম খণ্ড)
৪। চর্চ্চা (প্রথম খণ্ড)
৫। নীতিবাদ (প্রথম খণ্ড)
৬। কালচার (প্রথম খণ্ড)
৭। চক্রতত্ত্ব (প্রথম খণ্ড)
৮। স্বাস্থ্যতত্ত্ব (প্রথম খণ্ড)
৯। একত্ব
১০। আভিজাত্য
১১। প্রণয় ?
১২। অভিব্যক্তি
১৩। আমিময় (প্রথম খণ্ড)
১৪। ঈশোপনিষদ্ খণ্ডন
ও
শ্রীমৎ বালকব্রহ্মচারীর মতবাদ প্রতিষ্ঠা
১৫। কেনোপনিষদ্ খণ্ডন
ও
শ্রীমৎ বালকব্রহ্মচারীর মতবাদ প্রতিষ্ঠা

৪/৩৭

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

PRESENTED

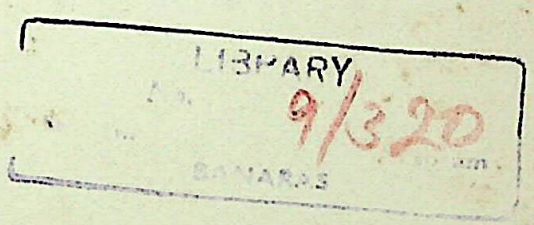

শূন্য ?

(প্রথম খণ্ড)

শ্রীশ্রী বালব্রহ্মচারীর বাণী-সংগ্রহ

শ্রীঅজিত ভট্টাচার্য্য
শ্রীশান্তিদাস মজুমদার
শ্রীহিমাংশু ভট্টাচার্য্য
কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত

সংগ্রহতন্ত্র পাবলিশার্স
৪৬, ভূপেন্দ্রবসু এভেনিউ কলিকাতা—৪
প্রথম সংস্করণ, ১৩৬০

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক :
শ্রীযোগেশচন্দ্র বিশ্বাস
সংগ্রহতত্ত্ব পাব্‌লিশার্স
৪৬, ভূপেন্দ্র বসু এভেনিউ
কলিকাতা—৪

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা
শ্রীপ্রিয়প্রসাদ গুপ্ত

বাঁধাই—
মোহন বাইণ্ডিং ব্যুরো
১১০, বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা—৯

মুদ্রাকর—
শ্রীবিহারীলাল দত্ত
নিউ ভিক্টোরিয়া আর্ট প্রেস
৬৪এ, বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা—৯

মূল্য—এক টাকা মাত্র

শ্রীউমাশঙ্কর গবেষণার

LIBRARY
No. 9/320
BANGLORE

পরমারাধ্য ঠাকুর

বালকব্রহ্মচারী শ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর

শ্রীপাদপঙ্কজে—

যাদের অফুরন্ত উৎসাহ, সাহায্য ও সহযোগিতায়
গ্রন্থপ্রকাশ সহজ হয়েছে,
হোমিও রিসার্চ লেবরেটরীর সেই সত্বাধিকারীত্রয়
শ্রীসুনীলকুমার ঘোষ,
শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ
ও
শ্রীরঞ্জিতকুমার ঘোষের
কথা আজ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি

ভূমিকা

বর্ত্তমান গ্রন্থসম্বন্ধে একটু কৈফিয়ৎ দেওয়া প্রয়োজন। গ্রন্থে বর্ণিত বিষয় আমাদের নিকট প্রায় দুর্ব্বোধ্য বলা চলে, অথচ শ্রীশ্রীঠাকুর যতবারই শূন্য সম্বন্ধে আমাদের বুঝাইয়াছেন, তাঁহার বলার গতি অসম্ভব দ্রুত থাকায় তাহা লেখনীতে ধরিয়া রাখা কোনবারই সম্ভব হয় নাই। বর্ত্তমান গ্রন্থসংগ্রহকালেও শ্রীশ্রীঠাকুর বিশেষ তাড়াতাড়ি বলিয়াছিলেন, অবশ্য আমরা হুবহু লিখিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু অত দ্রুততার মধ্যে কোথাও আমাদের অজ্ঞাতে অংশ বিশেষ বাদ গিয়া থাকিলেও তাহাতে বিস্ময়ের কিছু থাকিবে না, তথাপি আমাদের ধারণা সমস্ত তথ্যই সংগৃহীত ইহাতে থাকা সম্ভব। যাহা সংগ্রহ করিয়াছি. তাহাই প্রকাশ করিতেছি।

শূন্যবাদ অতীব প্রাচীনবাদ হইলেও বর্ত্তমান গ্রন্থ নামকরণের দিক্ দিয়া বৌদ্ধমতের সহিত সামঞ্জস্যযুক্ত হইলেও গ্রন্থে বর্ণিত শূন্যবাদ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে অভিনব, গ্রন্থাধ্যয়ন করিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

গ্রন্থের সমস্ত প্রকার ভুল ত্রুটির জন্য আমরাই দায়ী।

দোল পূর্ণিমা, ১৩৬০

শ্রীঅজিত ভট্টাচার্য্য
শ্রীশান্তিদাস মজুমদার
শ্রীহিমাংশু ভট্টাচার্য্য

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

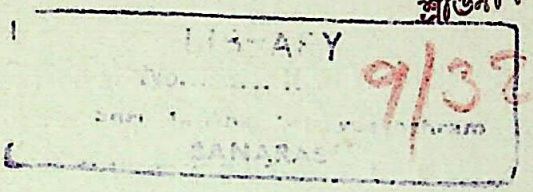

শূন্য ?

নানাপ্রকার দর্শনশাস্ত্রসম্পর্কে ঠাকুরের নিকট আলোচনা হচ্ছে ; বুদ্ধ, গৌরপাদ, গোবিন্দপাদ, শঙ্করাচার্য্য এবং নানারকম বাদের বিষয় নিয়ে এবং প্রত্যেকের তত্ত্ব ও দর্শন নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এবং বহু পণ্ডিত ও শিক্ষিত ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত, আমরাও উপস্থিত। মতবাদের পার্থক্য সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে, পণ্ডিতরা প্রত্যেকে এক-একজনের মতবাদ ঠাকুরের সম্মুখীন করছেন,—শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, কণাদের পরমাণুকারণবাদ, বুদ্ধ শিষ্যগণের সর্ব্বাস্তিত্ববাদ, বিজ্ঞানবাদ ও সর্ব্বশূন্যবাদ, শৈবগণের 'নিমিত্তকারণীভূত ঈশ্বর হইতে সৃষ্টি' ইত্যাদি নানা মতবাদ। ঠাকুরের মতবাদের সঙ্গে অন্যান্য মতবাদের কি পার্থক্য এবং কোথায় কোথায় মিল রয়েছে এসব বিষয় আলোচনা হচ্ছে এবং ঠাকুরকে বহুজনে জিজ্ঞেস করছে।

ঠাকুর বললেন, "কার কি মতবাদ রয়েছে সেই সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা না ক'রে আমি যা বলছি ঐ সকল মতবাদের সাথে তার কোথায় কি সামঞ্জস্য হয় বা না হয় তা নিজেরাই দেখে নিলে ভাল হয়, আর পছন্দ কথাটা সবার কাছেই সাধারণ শব্দ। কিন্তু বস্তুগুলো সেই পছন্দে কার কি আসবে, কে কি ভাবে গ্রহণ করবে সেটা হল যার যার পছন্দ বিবেচনার উপর এবং চিন্তাধারাগুলো সেই সেই ভাবেই প্রবাহিত হচ্ছে—সাধনমার্গের বেলায়ও এক-একজন যে পথ পদ্ধতি ধরে গেছেন এবং সত্য বস্তুর যে রূপ যখন প্রকাশ করছেন, সেই প্রকাশিত যে সুর বুঝবার জন্য যদি প্রকৃত রূপের প্রকৃতই পরিচয় দিয়ে দেয়, তবে বুঝতে অনেকের অসুবিধা হবে জেনেই বুঝ-ব্যক্তিরা নানারকম অবস্থা ও দৃষ্টান্তের ভেতর দিয়ে প্রকৃত রূপের ব্যাখ্যা করে যান এবং তাতে প্রকৃত রূপের কিছুটা বিকৃত হয়ে যায়, পরবর্ত্তী এইভাবে এইভাবে প্রকাশে প্রকাশে ক্রমশঃ ক্রমশঃ বিকৃতির মাত্রা আরও বেশী হয়ে যায়। তাই যেই রূপ বা যাঁর বর্ণনা করতে চেয়েছিলেন পরবর্ত্তী বৈষম্যতার ভেতর গিয়ে তা সন্দিগ্ধতায়ই থেকে যায়—তাই মতবাদ কার কি তা নিয়ে এখানে তর্কবিতর্ক এবং ভালমন্দ এই সমস্ত বলাবলি একবারেই সমাধান হয়ে যায় যদি নিজের বলার উপরে এবং চিন্তার উপরে আস্থা রেখে বস্তুত্বের তত্ত্বকে যদি জেনে নেয়, সেই তত্ত্বই সবাকার তত্ত্ব আবিষ্কার করবে—কে কোন্ তত্ত্বে অবস্থিত। আর শব্দ ও

Library
No.
BANARAS

ভাবের ভেতর দিয়ে বস্তুত্ব আর প্রকৃত অবস্থাকে বুঝিয়ে দেওয়া সেটা নিজে বুঝার চেয়ে কঠিন বলেই আর একজনের নিকট কঠিন হয়ে যাচ্ছে, তখন সে তা কঠিন বুঝ ব'লে যা চিন্তা করে সহজ করে নিতে চেষ্টা করল এবং সে যখন আবার আর একজনকে সহজ করে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে আরম্ভ করল, তার নিজে বুঝার চেয়ে তা আরও কঠিন হয়ে গেল, পরিশ্রমও হল অতিরিক্ত, পরিশ্রমীরা পরিশ্রম করে যা গ্রহণ করল তা তাদের নিকট আরও কঠিন হয়ে দাঁড়াল। সেও চেষ্টা করছে সহজ করে বুঝাতে, আবার বুঝাতে গেলেই তার বুঝের চেয়ে কঠিন হয়ে বেরুতে আরম্ভ করে, সেও তখনই আবার অবাক্; ঠিক হ'ল কিনা তা বুঝে ক্রমশঃ ক্রমশঃ যে আকারে আকৃতিতে ছিল বিক্রী হতে গেলে বিকৃত হবেই—গাছে-পাকা ঘরে আনলে তার চেয়ে আর একটু বেশী পাকবে—সেটা কি পাকার অবস্থা, না নরম অবস্থা, না পচনশীলের পূর্ব্ব অবস্থা? ঐ যে গাছে-পাকা, তাও প্রকৃত আকারের থেকে বিকৃত হল, এইভাবে বিকৃত হতে হতে মূল বীজটি ঠিকই থেকে যাচ্ছে, মূল বীজ পরিবর্ত্তিত হচ্ছে না, যদি পক্ক হতে হতে অবস্থা ক্রমে যদি আসে, কিন্তু অবস্থার চাপে অকালপক্ক বলে যা বর্ণিত হয়, তার মূলে তাকে পাওয়া যাচ্ছে না বা মূলে বিনষ্ট বলে বলা হচ্ছে। এখন যেই মূল বিষয় তত্ত্ববিদ্‌রা আওড়িয়ে আসছেন, এখন মূল বীজ হতে যে অঙ্কুরের উদ্ভব হয়ে ফল পর্য্যন্ত হল, তারপরও যে

গাছে-পাকা, তার পরবর্ত্তী অবস্থা আসতে আসতে কি অবস্থায় পরিণত হচ্ছে সেটাই ভাববার বিষয়; তবে শীলেও পাকে, জাঁকেও পাকে, তাতে মূলে বিনষ্ট যে হয় বাস্তবে বেশীর ভাগ তাই দেখা যাচ্ছে। মূল হতে যদি ক্রমশঃ ক্রমশঃ সাবধানতার সহিত সাবধান নিয়ে নিয়ে আসা হয়, তবে মূলকে সাবধানেই রাখা যায়। আজ যে মতবাদের ভিতরে মতানৈক্য তার অসাবধানতার জন্যই, আজ যে মূল বিকৃত অবস্থায় দৃষ্ট হচ্ছে—অসাবধানতা নিজেদেরই হবে, অসাবধানতার মূল আর নষ্ট হয় না। নিজেদের অসাবধানতার জন্যই মূল বিকৃতিতে পরিণত হয়। প্রসঙ্গগুলো বাস্তব বলে যে বর্ণিত, সে ভাব হতেই আলোচনা হচ্ছে এবং সে ভাবের কথোপকথন দিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে, তবে তত্ত্ববিষয় নিয়ে যখন আলোচনা করা হয় তখন কোনটা ব্যবহারিক, কোনটা নামিত, কোনটা অভিহিত ইত্যাদি প্রয়োগ করা হয়—এটা হচ্ছে যার যার ভাবপ্রবণতায় চিন্তার ভেতরে যা যা প্রকাশিত হয় তা দিয়েই এই পরিদৃশ্যমান জগতকে যার যার চিন্তাধারা এর উপর প্রয়োগ করে থাকে—কেউ বলছেন শূন্যবাদ, কেউ বলছেন শূন্যময়, কেউ বলছেন ব্রহ্ম, কেউ বলছেন চৈতন্যময়, কেউ বলছেন স্রষ্টাই স্বয়ং, কেউ বলছেন আমিই সব; এখন বিভিন্ন রকম বিভিন্ন অবস্থায় যে এই 'পরিদৃশ্যমান' তাদের নিকটে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে যার যার দৃষ্টিভঙ্গিমা অনুযায়ী, এখন এই দৃষ্টিটুকুনু কার কত তীক্ষ্ণ সেটার উপরে নির্ভর করছে সববিছু। তবে যে যাই বলুক,

যে যাই করুক, তত্ত্ব থাক বা না থাক, যাই হউক, পরিদৃশ্যমান জগৎ চলছে, সৃষ্টিও চলছে—আবিষ্কারকেরা আবিষ্কার করেও চলছেন—করলেও 'আচ্ছা', না করলেও 'আচ্ছা', তাতে কল্যাণ অকল্যাণ বেশী নির্ভর করছে না—মানলেও যা, না মানলেও তা। তা বলেই মনে হয় সে দিক্ দিয়ে নির্ভয় এই চিন্তা ভেতরে বহাল হয়েছে বলেই এক এক পন্থীরা যে যে ভাবে পারেন এই পরিদৃশ্যমান জগতকে রূপ দিয়ে গেছেন, তাদের নিকটেও পরিদৃশ্যমান জগৎ অনুভূতিতে ছিল। তাদেরও দর্শন তাদেরও ত অনুগামী আছেন—যারা এই পরিদৃশ্যমান জগতকে বাস্তব বোধেই চিন্তা করে গেছেন যে, এই বাস্তবেই শেষ, তারাও অনুভূতি হ'তেই দর্শিয়ে গেছেন, তারাও দর্শন সৃষ্টি করেছেন। ভক্তিপন্থীরা ভক্তিমার্গের ভেতর দিয়ে স্রষ্টাকে উপলব্ধি করেছেন, উপলব্ধি করে এই জগৎ তাঁরই দান তাও দর্শিয়ে গেছেন, তাদেরও দর্শন এখানে আছে; এখন যুক্তিতে কোনটা টিকবে না টিকবে সেটা পরবর্ত্তী বিবেচ্য। তারপর যুক্তি বলে যেটা সেটা যে প্রকৃত যুক্তিই, বা অযুক্তিরই একটা অবস্থা কিনা তা কে জানে; তারাও যুক্তি দাঁড়া করিয়ে একটা দর্শিয়ে গেছেন, তাদেরও দর্শন আছে—বাস্তব বস্তুর সংমিশ্রণে যে অবস্থার সৃষ্টি, তা দিয়ে যা যা হয়, বিজ্ঞানবিদ্‌রা ঐ সকল বস্তু নাড়াচাড়া করে ঐ বস্তুর তত্ত্ব বের করে যা যা দর্শিয়েছেন, তারাও বেশীর ভাগ এক জায়গায় হারিয়ে গিয়ে অনুভূতিসাপেক্ষ ঐ আবিষ্কৃত বস্তুর উপর দিয়েই সব

বস্তুই যে আবিষ্কৃত হবে তা বলা কঠিন। তারাও তত্ত্ব দিয়ে যাচ্ছেন, দর্শন তাদেরও—বস্তুবাদ দিয়ে যে যত বেশী নাড়াচাড়া করেছেন, সাময়িক সাফল্যের জন্য যে সাময়িক প্রশংসা নিলেন, পরবর্ত্তীটা সাময়িকই লীন হয়ে যাচ্ছে, সাময়িকটা চিন্তাধারায় ক্রমশঃ ক্রমশঃ ক্রমবিকাশে গুরুত্বটা লাঘব হয়ে যায়, তখন বলাবলিতে natural course, natural gift এমনই হয়ে গেছে, credit, যেন সঙ্গে সঙ্গে লীন হয়ে গেল—ঐ তাদের একজাতীয় দর্শন চলছে, যারা চৈতন্যময় জগৎ দেখছেন তারা বস্তুবাদ দিয়েই চলছেন—বস্তুবাদ ছাড়া কেউ যাননি। বস্তুবাদ দিয়ে সবারই যেতে হয়েছে, পরে কেউ গিয়ে বস্তু অস্বীকার করেছেন, জগতকে অস্বীকার করেছেন, নিজকে অস্বীকার করেছেন, কেউ রজ্জুতে সর্প ভ্রমে 'জগতকে মিথ্যা ভ্রম' বুঝিয়ে গেছেন, কেউ সমস্ত 'বস্তুই বিরাট, চৈতন্যও বিরাট তাই বুঝিয়ে গেছেন। প্রত্যেকেরই উপলব্ধিতে অনুভূতিতে চিন্তার প্রখরতায় এক একজন এক-একটা দর্শন তত্ত্বহিসাবে বের করেছেন। কেউ আবার ধ্যানগম্ভীরে বের করেছেন, কেউ নির্ব্বিকল্প হ'তে বের করেছেন, কেউ সমাধিতে বের করেছেন, কেউ দর্শনে বের করেছেন, আবার কেউ আন্দাজে বের করেছেন, কেউ আয়াসের উপর বের করেছেন, কেউ কল্পনার উপর base করে বের করেছেন, কেউ বস্তু যখন আছে, সেই বস্তুবাদের উপর নির্ভর করে পরবর্ত্তীগুলোতে এমনি চালিয়ে গেছেন—সবাই ত দর্শন হিসাবে বের করেছেন। আমার ব্যক্তিগত মতে যেটা এসেছে

LIBRARY
No.
BANARAS
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

সেটা পরিদৃশ্যমান জগৎ—সব—নামে অভিহিত। এই যা দেখছি, খাচ্ছি, চলছি, কথা বলছি, জ্ঞানবুদ্ধিবিচার চৈতন্য, বস্তু সব নামেই নামিত, নামেই অভিহিত। বস্তুত্বের অস্তিত্ব নিয়েই এখন দেখছি 'গোল', তাই বস্তুর অস্তিত্বকে পাচ্ছি অস্তিবিহীন। এই ব্যবহারিক চিন্তা জ্ঞান বুদ্ধি বিচার ধ্যান ধারণা যোগ জপতপ সাধনা সমাধির সকল রকম স্তব, সকল রকম ব্যবহারিক বিভূতি, যা যা শাস্ত্রগত—পালন করলে যা যা হওয়া দরকার তা নিয়েই যিনি এগিয়ে গেছেন, তাদের চিন্তাতেও এই নানা ধরণের মতবাদেতেই নানা দর্শনের সৃষ্টি হয়েছে। তত্ত্ব নিয়েই যখন আলোচনা হচ্ছে এই বস্তু হতে যা যা জ্ঞাতে আসছে, তা নিয়ে বস্তুত্বের তত্ত্ব বের করতে হবে এবং এই বস্তুতে মনোনিবেশ করেই বস্তুত্বের তত্ত্ব বের করতে হবে। এই তত্ত্ব ধরে ধরে বস্তুর অস্তিত্ব কোথায় তা দেখতে হবে এবং সেই বস্তুকে আশ্রয় করেই চলতে হবে, তারপর যা গিয়ে যা চিন্তাতে আসবে, তাই প্রকাশিত হবে—যেমন সাগর, তার পূর্ব্বাভাষের পরিচয় দিচ্ছে নদী, খাল, বিলগুলো, সেই খাল বিল দিয়েই যেমন সাগরকে পাওয়া যায়, সেই পূর্ব্বাভাষের আভাস দিয়েই সেই আভাসকে পাওয়া যায়, এরকম বহু আভাসের আভাস দিয়েও সেই আভাসকে জানা গেছে, সেই প্রমাণে প্রমাণিত এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সব সময় চলছে লক্ষ্য করলে তা লক্ষ্যে আসবে, তবে কতকগুলো সাধারণ প্রমাণে সাধারণ দিয়ে আলোচনা করা যাচ্ছে, সময় খুব কম, তাই অল্পের

ভেতর দিয়েই যে আভাস জানান হচ্ছে তা হল এই যে, অজানা একটা অবস্থা, সর্ব্বজ্ঞতাতে অজ্ঞ, অন্তর্য্যামিত্বতে হীন, প্রতিটি অবস্থাই মৃতবৎ অবস্থা—কথাগুলো বুঝাবার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে, অঙ্গের কোন অঙ্গেই সাড়া বলে যা দিচ্ছে, সাড়ার একটু ব্যতিক্রম হলেই সে অঙ্গ আর সাড়া দিচ্ছে না, যেন আগেই মৃত হয়ে রয়েছে, ক্রমশঃ ক্রমশঃ অবসন্ন পর্য্যন্ত এই যে নানা ব্যতিক্রমের অবস্থা—ঠিক খাল বিল নদীর যেমন অবসানটি সাগর—এখানেও শেষ হয়নি একটা সাধারণ দৃশ্যমানে যা দৃষ্ট হচ্ছে এই অজ্ঞ বা অজানার সুর যাকে জিজ্ঞেস করা গেছে, এই পর্য্যায়েতে সবাই পড়েছেন, এই অজানার অবস্থাটা কোন আভাসের আভাস, এটা কি নাইএর আভাস, না আছেরই আভাস—এই অবসানের অবস্থাটি মৃত্যু অবস্থা বলে যাকে বলা হচ্ছে এটা কোন্ আভাসের আভাস—'নাই'এরই কি বলে মনে হয় না—এই যে পরিবর্ত্তিত অবস্থা, এটা কোন অবস্থা ? যে রূপটি আছে, যে রূপটি নেই যাকে ধরি সে নেই, ধরি আর নেই, তাতে কি 'নেই' প্রতিষ্ঠা হয় না, তবে ধরা ছোঁয়ার বাইরে যেটা সেটা যতই অসীম নাম দেওয়া যাক্ না কেন, ধরা ছোঁয়ার পরে যেটা থাকে না, সেটা নাই বলতে হবে। প্রতি মুহূর্ত্তে যে অবস্থাটি দেখা যাচ্ছে সেই অবস্থাটি তারপরে আর পাওয়া যাচ্ছে না—তাকে আর পাওয়া যাচ্ছে না, এই যে আছে তারপর নেই, এই বস্তু কি—এইভাবে এইভাবে বস্তুত্বের তত্ত্ব খুঁজে যতই যাওয়া গেছে, সম্মুখীন বস্তু দিয়েই যাওয়া হচ্ছে, যখন সেই বস্তুর রূপ

আর থাকছে না, পরবর্ত্তী রূপও তার পরে আর থাকছে না। 'এই থাকছে না, থাকছে না' করতে করতে পরে থাকে কিনা সেই বিষয়ে যদি সন্দেহের উদ্রেক করে দেওয়া যায় অথবা যদি বলি এটা নেই, তবে কি প্রমাণ আছে যার দ্বারা হবে প্রমাণিত, পরিদৃশ্যমান জগতকে করবে প্রমাণে প্রমাণিত। দর্শকরা অনেক আগেই বুঝে হজম করে অনেক বেশী এগিয়ে আরও কিছু খুঁজবার চেষ্টাতে চলেছেন। ঐ প্রমাণে হয় না শুধু প্রমাণ, ব্যবহারিক যাই নামে অভিহিত হচ্ছে, যা যা দেখা যাচ্ছে, ব্যবহারিক যা যা আছে—খাওয়া, পড়া, সঙ্গম অনুভূতি, চিন্তা, জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচার কোনটা দিয়ে কিছুই করে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না, প্রত্যেকেই এই একজাতীয় সুর আওড়াচ্ছে তা হ'ল এই যে, যতটুকু দেখছি ততটুকু বলছি। কেউ আবার বলছেন, 'বুদ্ধি ও জ্ঞানের অতীত'; কেউ আবার বলছেন 'এও কি সম্ভব—সমুদ্রকে নুনের পুতুল দিয়ে মাপতে যাওয়া?' কিন্তু অসম্ভব বলে যে বলা এটাও যে একজাতীয় 'নাই'এর সুর গেয়ে যাওয়া। বিভিন্ন দেশের যেমন বিভিন্ন ভাষা—কেউ জল, কেউ পানী, কেউ water, কেউ বারি, আরও অনেক শব্দ আছে—কোনটা অসীম, কোনটা বুদ্ধির অতীত, কোনটা অসম্ভব এবং এই অসম্ভবকে অসম্ভব রাখার জন্য কেউ কেউ আবার বিরাট দিয়েও বুঝিয়ে গেছেন—এই বিরাটকে বিরাটত্বে রাখার জন্য অসীমকে অসীমত্বে রাখার জন্য ঐ সম্ভব জাতীয় মনেতে জ্ঞান বুদ্ধি বিচার যা যা নামে

অভিহিত বলে রয়েছে, তা দিয়েই মন্তব্য করলেন যে অসম্ভব। এই অসম্ভব আর সম্ভবে আসছে না, তাতে কিছুই না বা 'নেই'-এর-ই একজাতীয় সুরের আভাস নানাপ্রকার ছন্দের ভেতর দিয়ে ছন্দে প্রকাশ করে যাচ্ছেন। একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলেই লক্ষ্য হয়—রক্তকণিকা হতে আজ সৃষ্টিতে যে কণিকায় পরিণত হয়েছে, তার আগেও অনেক কিছু আছে, এই কথাগুলো একত্রিত হয়ে যখন এই সৃষ্টি, এই কথাতেও সবই যখন বিদ্যমান ছিল, এরা সূক্ষ্ম বলে নামে অভিহিত হল; সৃষ্টির অতীত বলে অদৃষ্ট বস্তু বলে ঐ একজাতীয় সুপ্ত অবস্থা যেন রক্ষা করে আসছে, সুপ্ত বলে যে বলা সেটা মিলিতেরই গান গাওয়া—সমাধি নির্ব্বিকল্প তার পর্য্যায়েই গিয়ে পড়েছে, ঐ সূক্ষ্ম সূক্ষ্মগুলো যখন দৃষ্টে এলো, অবসানেরই অবস্থা যেন প্রাপ্ত হল। এই অবসান প্রতি অবস্থার নিকটেই এই পরিবর্ত্তিত অবস্থাই যেন অবসান অবস্থা, ঘুমন্ত অবসানের পূর্ব্বাভাষের আভাস, সমাধি নির্ব্বিকল্প অজানা অজ্ঞ ইত্যাদি আভাসের আভাস, আভাস দিয়েই আভাসকে পাওয়া যাচ্ছে, রোগ শোক ইত্যাদি তার পর্য্যায়েই গিয়ে পড়ছে—হাসিকান্না একই অবস্থা, সবকিছুই যেন অভাব বোধে কান্না করছে, যা কিছু করছে অভাবকে ঘুচাবার জন্য প্রচেষ্টা করছে, অভাবকে যে পূরণ—প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতি জীবে তা জাগরিত, এই যে অভাববোধ প্রতি অবস্থাতে—খেয়ে আবার খাওয়ার জন্য পাগল, সঙ্গমের পরে সঙ্গমের জন্য পাগল, তৃপ্তির পরে তৃপ্তির জন্য পাগল—নিবৃত্তি আর হচ্ছে না,

অভাব তাও যে পূরণ হচ্ছে না—এই যে অভাব সেটাও কি ফাঁকা অবস্থা নয়? এই ফাঁকা অবস্থা বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত আছে বলেই বস্তুগুলো অভাবের সুরে সুর দিচ্ছে, হতে পারে পূর্ণ বলে যে বলা হচ্ছে পূরণের জন্য এগিয়ে যাচ্ছে বলে পূর্ণ অবস্থিত—তা পূরণের জন্য যাওয়া পূর্ণ পূর্ণে আছে,—এই যে বলা, অভাবকেই যেন পরিপূর্ণ করলাম। পূর্ণ যে শব্দটি অভাবটি আছে বলেই পূর্ণ কথাটা, নতুবা পূর্ণের definitionটি কি ভাবে হল; অন্ধকারটি—আলোই তার প্রমাণ—অভাব ও পূর্ণ একই সূত্রে আবদ্ধ। এই অভাব বস্তুতে যখন প্রতিষ্ঠিত, বস্তুই তার প্রমাণ, বস্তুর সাড়া তার প্রমাণ, চাওয়াপাওয়াতে তার প্রমাণ; এই অভাবটিই যে দেখছি প্রতি অবস্থায় শতকরা কোটিভাগ বিদ্যমান, আরও বসালেও আপত্তি নেই, বেশীর ভাগ যাই তাই তো গ্রাহ্য, সাধারণতঃ চুম্বকের ঘর্ষণে চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয়—এই যে অভাব বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত, বস্তু অভাব বোধে অভাবময়ে পরিণত হয়ে যে ফাঁকার অবস্থায় রয়েছে না তার কি প্রমাণ? এটা যে ফাঁকারই একটি অবস্থার অবস্থা নয় তা কি করে বলা যায়। যাক্ সে কথা—কি যেন জিজ্ঞেস করেছিলে সেটা হারিয়ে যেন অন্য দিকে যাচ্ছি, আমার নিজস্ব উপলব্ধিসম্পর্কে নিজে বলতে চাই না; তার কারণ, না বলার মনের অবস্থাটি—এদিক্‌কার অবস্থাই তার জন্য দায়ী, নিজের কথা বলা বা নিজের অনুভূতিসম্পর্কে বলা, নিজের বিভূতি সম্পর্কে বলা একটু যশে মানে প্রতিষ্ঠায় অহঙ্কারে এখানে

পরিণত হয় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে। কারণ, ছোট বয়েস হতে যখন সবকিছু বলা হত, তখন ছোট বয়সের ছেলেমানুষ বলেই ক্ষমার মধ্যে যেত; কারণ তখন আমার উপরে যশ মান অহঙ্কার আরোপ করতে নিজেরাই লজ্জিত হত, সেটা যারা ভুলে গেছে, এখন বয়সের সাথে এগুলে আরোপ করতে আর দ্বিধা করছে না, তাই আমার বলার ভঙ্গিমার channelটি অন্য channelএ আছে, সেটা হল ভদ্রতা আতিথেয়তা, হাবভাব ভঙ্গি দেখে যতটুকু না বললে নয়, ততটুকুনু বলেই কে কি মনে ভাববে এই ভাবনাটার জন্য বলা প্রয়োজন বোধ করি না, সত্যকে সেইজন্য বিকৃত করা হয় না, বলব না বলেই তা জানিয়ে দিই। যাক্—যখন জানতে চাওয়া হয়েছে, দুই একটি ছোট বয়সের কথার উপর বলা হচ্ছে যে, কিছুই 'না'র অবস্থাটি কি করে বলা হল শূন্য অবস্থা বা ফাঁকা অবস্থা। কেন এত জোর দিয়ে বলছি, কোন উপলব্ধি আমার মধ্যে এসে বস্তুগুলো সব অস্বীকার ক'রে বসেছে, ছোট বয়স হতেই শাস্ত্রগত বুদ্ধিগত চিন্তাগত যা যা জ্ঞাতে অভিজ্ঞতাতে বুদ্ধিবৃত্তিতে যা এসেছে তা দিয়ে জানবার আগ্রহে এগিয়ে যাওয়া হত এবং যখন যা কিছু শোনা হত প্রত্যেকটিকে ভাল করে বুঝে নেওয়ার প্রবৃত্তি হত। ধ্যান ধারণা জপ তপ কোনটাই বাদ দেওয়া হয়নি, 'সমাধি' বলে যা বলা হত তাও হয়েছিল। কিন্তু যে কোন অবস্থাই হত—সমাধি, নির্ব্বিকল্প, কি আরও বেশী তত্ত্বে লীন হ'য়ে যাওয়া,

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

কিন্তু একটা সত্তা সবগুলোকে বুঝিয়ে দিত এবং যখন বাস্তব এই কায়াতে বাস্তব জ্ঞান বুদ্ধি বিচার দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া হত, তা ঐ সত্তার জন্য ঐগুলো বুঝে নিতে পারতো, কোথায় কি অবস্থায় ছিলাম তা বুঝে নিতে পারতো—যেমন স্বপ্নে দেখলে জাগলে তা মনে করে বলা যায়, ঐ সুপ্ত অবস্থায়ও মনের সত্তার চৈতন্য সুপ্ত চৈতন্য অবস্থায় ক্রিয়া করেও জাগরিত অবস্থায় কার্য্যকরী হল, তাই জাগরিত অবস্থায় স্মরণে বিস্মরণ হয়নি, সেই রকম সমাধি নির্ব্বিকল্প স্মৃতিপটে যা যা আসত এখানে বিস্মৃতি হয়নি। বিভূতিগুলো যারা যারা দেখেছেন, ঐ অবস্থায়ই অনেকে দেখেছেন, তারা এসে বলতেন, অবাক্ হওয়ার কিছু ছিল না। আমি ভাবতাম কখন হ'ল, এই পর্য্যন্তই চিন্তা করতাম আর বিভূতিগুলো যে নানাজনে নানাভাবে দেখত, সেগুলো একটা কিছু যে অদ্ভুত তা চিন্তা করিনি, চিন্তার সাথে সাথে ঐগুলো হয়ে যেত কিনা, তাই থুথু, কফ ইত্যাদির মত ফেলে দিতে ইচ্ছে—ফেলে দিতাম। সুতরাং এই চিন্তা মন ক্রমশঃ ক্রমশঃ একত্রিত করে সেই বস্তুর জন্যই পাগল হতাম এবং বস্তুত্বের তত্ত্বে আরও বেশী যখন এগিয়ে যেতে আরম্ভ করলাম, তখন তত্ত্বে নিজে নিজেকে সর্ব্ব বস্তুতে দেখতে আরম্ভ করলাম; ভাবলাম, বিকৃতির অবস্থা না প্রকৃতস্থের অবস্থা—সেই ভাবনাও এই ভাবেতেই ছিল, তখন ভাবনার ভাবে আরও বেশী একাগ্রতার প্রচেষ্টা করা হত ঐ প্রকৃত বস্তুর সন্ধানে, ঐ বস্তুতে যখন সর্ব্ব অণুতে সর্ব্ব বস্তুতে নিজেকে খুঁজে

নিজের সত্তাকে খুঁজে পেতে আরম্ভ করলাম—এই যে বুঝটুকুনু এক সত্তাই উপলব্ধি করে এই কায়াতে স্মরণ করিয়ে দিত, তখন এখানকার বুদ্ধি বৃত্তি চিন্তাধারা ঐ সত্তার ঘর্ষণে সেইগুলোও সত্তায় সত্ত্বে পরিণত করত, তাই দেহের ইন্দ্রিয়াদি সেই ভাবেই ভাবিত থাকত। সেই ছোট বয়েস থেকে ঠিক আট নয় বছর বয়স হতে ক্রমান্বয়ে এই বস্তুত্বের তত্ত্ব বের করতে করতে সমস্ত তত্ত্বে যখন নিজের সত্তাকে পাওয়া যেতে আরম্ভ করল, তখন নিজের সত্তাই যেন বিরাটের সত্তা—এটা বুঝা গেল, জানা গেল। এই যে জানা গেল আর একটির চেতনার চেতনাধীনেই ঐ চেতনাতে যখন নিজেকে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হ'ল, তারপরও আর এক চেতনায় চৈতন্য করে দিল। যখন যেই অবস্থায় যার মধ্যেই প্রবেশ করা হয়—চৈতন্য বিদ্যমান, চেতনা সেখানেই বিদ্যমান, তাই কায়াটিও সেই সত্তার সত্ত্ব হতে বহিষ্কৃতে আর যাচ্ছে না। তাই আবিষ্কারকেরা গ্রন্থ সেই ভাবেই আবিষ্কার করে এসেছেন, তবে বলতে গেলেই একটু বিকৃত হয়ে পড়ে স্বাভাবিক—চৈতন্য ও চেতনার বর্ণনা হয় না, চিনির মিষ্টত্ব সম্পর্কে ভাবভঙ্গির বিকৃতি ও ভাষার কাঠিন্যে প্রকাশ হয়ে থাকে, মিষ্টত্ব সম্পর্কে জানানো আর গেল না—চৈতন্য ও ব্রহ্ম ও অসীমের বেলায়ও ভাষা ও ভাবভঙ্গিমার ভেতর দিয়েই হচ্ছে প্রকাশিত। বস্তুত্বের তত্ত্বে যে মিষ্টত্ব তা আর জানিয়ে দেওয়া গেল না, তবে তখনই বলা হবে, একটু মিষ্টি হস্তে দিলেইতো সব চুকে যায়, তাতেও হয় না, মিষ্টত্ব কারো কাছে আবার তিক্ত বলেও গণ্য হয়, আর

9/320 শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

মিষ্টত্ব যে রূপে রূপান্তরিত হল, যে রূপের মিশ্রণে রূপান্তরিত হল, তার একটিতে গেলে তা আর থাকছে না, তখনই আসলো আবার সন্দিগ্ধতা, মিষ্টত্ব কোথায় হল লুক্কায়িত। মিশ্রিতে যে মিশ্রিযুক্ত স্বাদ সেটা অমিশ্র স্বাদের স্বাদ ঐ স্বাদ দিয়ে ভিন্ন ভিন্নকে বহিষ্কৃত করা—ঐটুকুনু দিয়েই সবটুকুনু বুঝা যায় না। গোমূত্র পান করলেই দুগ্ধ পান করা হল না, দুগ্ধ পান করলেই 'গো'কে খাওয়া হলো না, যে কোন পানে তৃষ্ণার সন্ধানটুকু জানিয়ে দিচ্ছে, তৃষ্ণার্ত্ত অবস্থাটি স্বাদের অবস্থা, যে কোন স্বাদই তৃষ্ণার সন্ধানে তৃষ্ণার্ত্ত হিসাবে এগিয়ে যাচ্ছে তৃষ্ণা নিবারণ করার জন্য—তা হল স্বাদ কি মিষ্টত্ব যে কোন সঙ্গমের স্বাদ, যে কোন তৃপ্তির স্বাদ বা তৃপ্তি বলে যা বলা হচ্ছে—এটা হল channel, এটা একটা junction—junctionএ সমস্ত জায়গার লাইনগুলো একত্রিত—junctionএ এলেই channelগুলোর সন্ধান পাওয়া যায়, সেটাই সমস্ত জায়গার গতিবিধিগুলো বহিষ্কৃত করে, সেই স্বাদটাই হচ্ছে junctionএর স্বাদ, সেটা হল মিশ্রিযুক্ত স্বাদ, মিশ্রণের স্বাদ, ধারাবাহিক অনুযায়ী না গেলে—ঐ স্বাদে থাকলেই প্রকৃত অবস্থাটি পাওয়া গেল না ; এখন যা পাচ্ছি তা প্রকৃত অবস্থা নয়—যদি প্রকৃতি অনুযায়ী এগিয়ে না যাই এই কায়াতে যে সুখ দুঃখ ইন্দ্রিয়াদির গ্রাহ্যে যা যা আসছে, যা যা উপলব্ধি করা হচ্ছে তাতে যে ধ্যান ধারণা জপ তপ সমাধি নির্ব্বিকল্প ইত্যাদি অবস্থা স্বাদেরই অবস্থা, ঐ অবস্থার ভেতর দিয়েই কেন্দ্রস্থল বেরিয়ে

পড়ে। কেন্দ্রকে অনুসরণ করেই কেন্দ্রস্থল—সুপ্ত অবস্থা, ঘুমন্ত অবস্থা, সমাধি অবস্থা— ভ্রাতৃসম্পর্কে যেমন সম্পর্কিত, নির্ব্বিকল্প জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—পিতৃ আভাস এরাই, এরপর পর পর আভাসেরই আভাস, তেমনি সমাধি এ অবস্থাটা যে জানিয়ে দিচ্ছে সে যে চেতন তার চেয়ে তার অধীন চেতন যখন নিজে সচেতন, হয়েস্ব অধীনে যখন সমাধি হয়, সে অবস্থাও আরেক অধীনের অধীন। এ চৈতন্যেও যখন মনোনিবেশ—মন বিদ্যমান থেকে চৈতন্যের ধ্যানই করে যাচ্ছে। তখন তার সত্তা সর্ব্বব্যাপ্তমান সেই আভাস এই কায়াতেই দিয়েছিল ; সুতরাং তত্ত্ব যখনই খোঁজা হয়েছিলো তখন বস্তু দিয়েই যখন যাওয়া যেতো—এমন এক অবস্থায় যাওয়া হচ্ছে সেখানেও বস্তু—নিজের যে এই অবস্থাটি প্রতি-বস্তুটির অবস্থা পাওয়া গেছে ঐ অবস্থা হতে, এই কায়াটিকে সম্পূর্ণ বুঝা গেছে দেখা গেছে, অন্যকে ডেকে ও বলে যাওয়া হচ্ছে, তাও এই কায়াতেই স্মরণের মধ্যে পাওয়া গেছে, যারা দেখেছে তাদের নিকটও সহজ হয়ে গিয়েছিলো, তাদের নিকট কঠিন হলেও সকল অবস্থার মধ্যে এই যে বুঝিয়ে দিচ্ছে জানিয়ে দিচ্ছে সেই বুঝটুকুনু—সেটা কোত্থেকে আসছে, কোত্থেকে হচ্ছে, মনে হয় বুদ্ধির অতীত জ্ঞানাতীত —অতীতের মধ্যে যেন বিরাজ করছে। কিন্তু অতীত বর্ত্তমান হয়েই কার্য্যকরী হচ্ছে, তাই সেটাকে অতীত বললে সমীচীন হবে না, সেটা বর্ত্তমানেই রাখা সমীচীন। শূন্য ও মহাশূন্য লীন নির্ব্বাণ—ব্রহ্মে লীন অবস্থাগুলো সম্পর্কে

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

যে জ্ঞাত বুঝ সেই বুঝটুকুনু বুঝ হতেই জানা গিয়েছে, এই কায়াতে তাও চেতনাধীন—কি মহাশূন্য, কি নির্ব্বাণ, কি লীন, যেখানে সংজ্ঞাহীন জ্ঞানহীন জ্ঞানলুপ্ত সংজ্ঞালুপ্ত ভাষা ইত্যাদি সবকিছুই সবই নির্ব্বাণ করে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেখানেও কোন অবস্থা এই অবস্থাকে জানিয়ে দিল, মিশে যাওয়ার অবস্থাকে জানিয়ে দিল, শূন্যের descriptionকে জানিয়ে দিল, নির্ব্বাণ অবস্থাকে জানিয়ে দিল, কোন চৈতন্য সূক্ষ্মাকারে কার্য্য করছে এ ভাবের অভিব্যক্তি কোথা হতে হল আবির্ভূত—ইহার স্রষ্টা কে? কে এটা করছে, এই সকল অবস্থাকে যিনি জানিয়ে ও বুঝিয়ে দিচ্ছেন তিনি তাদের চেয়েও সচেতন, নির্ব্বাণ হলেও নির্ব্বাণকে তিনি অধীনে রেখেছেন, মুক্তি লীন সবই চেতনাধীন—ঐ চৈতন্য কোন অধীনে সেই অবস্থায় যখন এগিয়ে যেতে আরম্ভ করলাম, ঐ অধীনকে অধীনে আনতে হবে—কোন অধীনে সেই অধীন—সে 'একটি' কে, কোন একটি হতে এই একটি আসলো, সেই একেরেই জানতে একেরই খোঁজে বেরিয়ে যেতে আরম্ভ করলাম—খুঁজতে হবে, বের করতে হবে সে 'এক' কোথায়, কোন অন্তরালে লুকিয়ে আছে, লুকিয়ে থাকলে কি করে চলবে। এক না থাকলে আর এক কোত্থেকে আসবে সেই এককেই বের করতে হবে; জীবনের আরম্ভের প্রথম প্রশ্ন সকলের কাছে এটাই থেকে যাচ্ছে, বিরাট পরিশ্রমের পরও এই একই প্রশ্নের উদ্ভব হচ্ছে। সমস্যা সমাধানের জন্য মাঝখানে কসরত—কসরতের পরিণামে কি লভ্য সেটাই বিবেচ্য বিষয়, যাক্ সে কথা। একটিকে

একের এককে এখন জানতে হবে, এর আগ পর্য্যন্ত শাস্ত্রগত আইনগত পথগত সমস্ত অবস্থাতে যত রকম কার্য্যপদ্ধতি আছে —সব পথ অবলম্বন করে যা যা হওয়া দরকার ক্রমশঃ ক্রমশঃ ক্রম বিকাশে তা হওয়া সত্ত্বেও সমস্ত শক্তিকে একত্রিত করে যখন 'একে'র অন্বেষণে যাওয়া হল—এর আগে আর একটি কথা বলা হচ্ছে—যখনি 'একে'র সন্ধান করতে না পেরেছেন, কতক পন্থীরা সেই অবস্থাকে বলেছেন, বিরল, যুগ যুগ তপস্যার দরকার, নানারকম কঠিন কাঠিন্যের অবস্থা, অসম্ভব অবস্থা বলে ঐ অবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে এবং যে ব্যক্তিটি প্রাণপণ পরিশ্রম করেও তাদের হাত হতে রেহাই পায়নি তাদের নিকট এই সমস্ত পরিশ্রমীরা হাল্কাত্ব অবস্থাপ্রাপ্ত হয়েছে—অসম্ভব, এই কি হয়, এই কি পাওয়া যায়, নানারকম হাল্কা কথা বলে তাদের উড়িয়ে দিলে চলবে না; কারণ, যারা বললেন তারা কোন অনুভূতি হতে বললেন, সে অনুভূতিতে যে বললেন, সে অনুভূতিকে যে চালিয়েছেন, সে ভূত কোন অধীনের অধীন; সুতরাং তার বলা যে ঠিক বলা, সেটাকে যে গ্রাহ্যে আনতে হবে তার কি মানে আছে—সেও তো সমস্যা হতেই বলেছে; সমস্যা চেতনাধীন, চেতনা সমস্যাযুক্ত হয়ে সমস্ত সমস্যাপূর্ণ কথপোকথনের ভিতর দিয়ে তার ভাব ব্যক্ত করে গেছেন—তাতে তো আর 'একের' সমাধান হল না—সেই একটি, কে যেই একটি প্রথম, সেই প্রথমের প্রথম কোথায়, তা আবিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত সমস্যাতে থেকে যেতে হবে। সেই যে চেতনাধীনে এই

সমস্ত মত পথ পদ্ধতি এবং এই সমস্ত বুঝ সমস্ত যাবতীয়—সেই চৈতন্যতে যখন আবার মনোনিবেশ করে সমস্ত ধ্যান ধারণা-এনে 'এক' বলে ডুব দেওয়া হল সমস্ত ক্ষমতা নিয়ে, তারপর যখন আবার দেখা গেল, তখন ছিলাম কোথায়; যেমন বেলা পাঁচটার সময় 'এক' অন্বেষণে ডুব দেওয়া হল—'হলটা' পর্য্যন্ত বুঝল, ডুব দিল কিনা বুঝল না, তারপর শেষ রাত্রি চারটার সময় সে নিজেকে ঐ আসনেই দেখল—বসল আর দেখল—এ দুটি অবস্থার সময়ের যে পার্থক্য তাতে দেখা গেল, এগারটি ঘণ্টার মতন এই সময় ছিলেম কোথায়—দুটি 'বসাকে'ই সে বুঝল—প্রথম বসা এবং দ্বিতীয় প্রশ্নের বসা—পাড় হতে এ প্রশ্ন করা হচ্ছে—প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছিলেম, 'কোথায়?' উত্তর দিচ্ছে—'কোথায় ছিলেম কে জানে।' ঐ অবস্থার যে কোন বর্ণনা করতে গেলেই চৈতন্য সচেতন থাকবেন, সুতরাং অবস্থার সম্পর্কে তখন জানা গেল—এবার কি মহাশূন্যেই লীন, না নির্ব্বিকল্পেই লীন, যে কোন অবস্থায় কিছু বলতে গেলেই কে বলল—বলাটা কার অধীনে; সুতরাং সেই অধীনের যে অধীন, চেতন চৈতন্য কোন চেতনাধীন, তার তো সেই সজাগে সজাগ হওয়া উচিত, যদি বলি কোন অবস্থাই থাকবে না, যদি বলা হয় চৈতন্যও থাকবে না, কিছু অবস্থাই থাকবে না, এই অবস্থা ব্যক্ত কে করল। কিছু না অবস্থার যে ব্যক্তি* এই অভি-ব্যক্তি কোন ব্যক্তি* হতে প্রকাশ হল—সেখানেও যদি চেতন

* ব্যক্তি=প্রকাশ

নাম না দিয়ে নূতন কিছু নাম দেওয়া হয় তাতে আপত্তি কিছু নেই, কিন্তু জানা তো গেল—তাতে তো আর সমাধান হল না—একের তো এক পাওয়া গেল না, কিন্তু পাড় হতে যখন বললাম, যে ওপাড় বের করতে হবে—এগার ঘণ্টা কোথায় ছিলেম, তাতে কি এই বলা হবে যে, যেতে যেতে পাড় পাওয়া যায়নি বলে বেদিশ্ হয়ে ফিরে আসা হয়েছে, তবু তো একটা দিশ পাওয়া যেত, তবু দিশ চেতনাধীনে কার্য্যকরী হচ্ছে—অসীম সেখানেই রয়েছে কোন অবস্থার অবস্থাই যে পাড় হতে বলা ছাড়া বলা হচ্ছে না, সেই পাড় হতে ঐ সময়ের পার্থক্য জেনে একটা মন্তব্য বসে বসে করা যেতে পারে যে, এগার ঘণ্টা এমন এক জায়গায় যাওয়া হয়েছিল যে একের একবিহীন; সুতরাং একবিহীনের পরবর্ত্তী যা কিছু সেই অবস্থায় অবস্থিত - শূন্যের মূল্য সেখানেই হয়---'এক' যদি থাকে---একের একই যদি না থাকে সেই শূন্যের মূল্য থাকে না, পাড় হতে বসে এরকম বলা-যেতে পারে, যারা বলে গেছেন এই এগার ঘণ্টার বর্ণনা, তারা ভাব ব্যক্ত করতে বিকৃত যদি না হয়ে থাকেন—বলা হয়েছে কিনা, তারা বলেছেন কিনা—আর বলে যদি থাকেনই, তবে গিয়েছেন কিনা, আর গিয়ে থাকলে তার চেতনাধীনেই তিনি বিরাজ করছিলেন। আর লীন বিলীন নির্ব্বিকল্প মুক্তি নির্ব্বাণ ঐ অধীনেই ছিলেন বিরাজিত এবং ঐ চৈতন্যকে চৈতন্য লুপ্ত করে লীন অবস্থায় বিলীন করে 'কিছুই-না' অবস্থার একটা অবস্থা সৃষ্টি করে ঐ অবস্থাকে বর্ণনা করেছেন। এখন ঐ যে বর্ণিত

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

বর্ণনায় আনলেন সে অবস্থা কোন অবস্থা থেকে করলেন সেটাই একটা ভাববার বিষয়, তা বাদ দিলে তো চলবেনা, তার ভাব লেখা লেখনী তত্ত্ব সবই যদি গ্রহণ করা হয়, তবে ভাবগুলো কোন ভাব হতে বহির্গত হল তাও দেখতে হবে। তিনি দর্শিয়ে গেলেন—এমনি এমনিভাবে সমাধি, এই জপ এই সাধনার দ্বারা সর্ব্বজ্ঞ হওয়া যায়। সবই না হয় প্রথম অবস্থায় স্বীকার করে নেওয়া হল, তারপর যেতে যেতে যখন এমন অবস্থায় যাওয়া হল যখন এককে বের করতেই হবে, ঐ এককে বাদ দিলে চলবে না, ঐ একের জন্য যখন প্রাণপণ চেষ্টা হল তখন এক আর একে এল না—দেখা গেল না—বলা যেতে পারে,বসে বসে নানা অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে বলে বলা যেতে পারে, তার দ্বারা সম্ভব হয়নি বলে যে সম্ভব হবে না তা নয়, এই অসম্ভবকে সম্ভবে আনতে অসম্ভব পরিশ্রম করতে হবে। সেই অসম্ভব পরিশ্রম তার দ্বারা হয়ে ওঠেনি, তাই অসম্ভব তার নিকট ধরা পড়েনি। কিন্তু তারা কোন অনুভূতি হতে বলাবলি করল—কোন চেতনাধীনে রেখে এই সমস্ত বলাবলি বাদাবাদি ঐ মূলকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ব্যস্ততা প্রকাশ করল, এই ব্যস্ততা কোন অবস্থা হতে আগমন, কোন অবস্থা তাকে জানিয়ে দিল যে ঐ অবস্থা এবং এই যে তাদের ধারণা যে অসম্ভব কিম্বা পরিশ্রমাধীন, নিশ্চয়ই কোন ধারণা হতে কোন অবস্থা হতে এ-গুলো বলাবলিতে প্রকাশ করল। তারাও সেই ধারণা হতে বলল, ধারণার উপর নির্ভর করা যায় না—সমাস্যাও করা যায়

না, মন্তব্যও করা যায় না—কাজে না নামা পর্য্যন্ত প্রমাণে তারা দিতে পারে না প্রমাণ, সুতরাং তাদের পথ অনুযায়ী নির্দ্দেশ অনুযায়ী যাকে চরম অবস্থা বলা হয়, সেই অবস্থায় গিয়ে সেই চরম পাড় হতে ঝাঁপ দিয়ে সেই স্রষ্টাটিকে বের করতে হবে—সেই মূল স্রষ্টাটি কে—মূল তো আর মূলে আসছে না ; প্রথম ঝাঁপ দেওয়ার সময় আর দ্বিতীয় ওঠার সময় বিশ ঘণ্টা হতে পারে, বার ঘণ্টা হতে পারে---এই যে এই সময় কোথায় ছিল, এই সময়টুকুনু কোথায় ছিল—পাড় হতে বসে তা চিন্তা হল---কেউ বলে উঠল ঘুমন্ত অবস্থা, সেই ঘুমন্ত অবস্থায়ও ঘুমিয়ে থেকে বুঝে নিতে পারে, ঘুমন্ত অবস্থাও কেউ ঘুম থেকে বুঝে নিতে পারে—ঘুমটা তার আগে, সুতরাং স্বপ্নের ভেতর দিয়ে সেই স্বপ্নটাকেও বুঝতে পারে ; সুতরাং ঘুমিয়ে থেকেও তার বিশ্রাম সম্পর্কে সে সচেতন, বার ঘণ্টা কি বাইশ ঘণ্টা কোথায় ছিল সে বুঝে নিতে পারতো। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় থাকলেও আর একটি অবস্থার সৃষ্টি হয়, সেটা সে বুঝে নিতে পারে, প্রত্যেকটি অবস্থা একটু না একটু সে বুঝে নিতে পারে—যেমন দেহ অবসানে তার যেমন আর দিশ পাওয়া যাচ্ছে না, সব ধারণাধীন এখনো চলছে সেই অবস্থা, এটাও যেমন সেই ব্যক্তি উঠে বলতে পারে না কোথায় ছিলেন, আর ওটা পারা যাচ্ছে বসে থেকে ; বার ঘণ্টা পরে বলে উঠল, কোথায় ছিলাম ? এই অবস্থার সমাধান না হওয়া পর্য্যন্ত সমস্যাতেই থেকে যাবে এবং পাড় হতে এই বর্ণিত হবে 'কিছুই না' অবস্থার সাড়া---কিছুই না

অবস্থার আভাসের আভাস চলছে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ যা নামে অভিহিত হয়েছে, এই দৃশ্যমান জগৎ হতেই আভাসের আভাস পাওয়া যাচ্ছে, তা একটু পর্য্যবেক্ষণ করলেই সমস্ত পরিষ্কার হয়ে যাবে বলে মনে হয়, দৃষ্টিতে দৃষ্টি নাই, ঘ্রাণে ঘ্রাণ নাই, শ্রবণে শ্রবণ নাই, ইন্দ্রিয়াদিতে যা যা গ্রাহ্যে আসছে কর্ত্তন করে ফেললে কোনটারই সাড়া নেই ; এই অবস্থাগুলো একটু পর্য্যবেক্ষণ করলে পরিষ্কার হয়ে যায়—কে নিচ্ছে তা পাওয়া যাচ্ছে, কোথা যাচ্ছে তা পাওয়া যাচ্ছে না, কে কার জন্য দায়ী, তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, একটা অবস্থা পাওয়া যাচ্ছে junctionবৎ তা দিয়ে যা যাচ্ছে খুঁজে আর পাওয়া যাচ্ছে না, এই যে অবস্থার পরিবর্ত্তণ 'নাই'এর চলছে আভাস, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ একটা ভৈরবীর সুর 'কিছুই না' একটা ভৈরবী সুর প্রাতের একটা সুর, সেই প্রাতের সুরই প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে রইল, পাড়ে বসে তাই বুঝা গেল দুপুর আর বিকেল পাওয়া যাচ্ছে না—'প্রাতঃ' এটা এখনও চলছে, এটাই সর্ব্বত্র বিরাজিত যদিও সবই নামে অভিহিত। সে যাক—এখানেই অনেকে গুলিয়ে গেছেন, কেউ কেউ ঐ অবস্থায় গিয়ে 'কিছুই না' অবস্থা পেয়ে গেছেন, যাকে বলে slip of tongue। কেউ কেউ ঐ অবস্থায় গিয়ে লীন অবস্থা বলেছেন, চরম অবস্থা বলে যা বলেছেন তা slip করে গেছেন, আর তা না হলে ঐ পাড় হতে বসে বসে গেয়ে গেছেন আর ঐ জায়গার বর্ণনা করে গেছেন বলে, আর এক পন্থীরা অসম্ভব বলে ধ্যানে বসে

রয়েছেন, তাদের নিকট আজও অসম্ভব, সম্ভবে আসলেও সম্ভব বলবে না, তবে তো সব মিটে যায়, তবে তো সবই গেল—অশান্তি কি নেই---এই অশান্তি পোহাবে এ ভেবেই অসম্ভব বলে রেখে নিজকে আত্মতৃপ্ত করে রেখেছেন, এও একজাতীয় সমস্যারই অবস্থা---অসম্ভবে তিনি লীন, সেখান থেকে মাঝে মাঝে দু একটি বাণী ছাড়েন, 'এও কি সম্ভব---দুর্বোধ্য, মুনি ঋষিরা যেখানে fail' ,এই fail তারাও কিন্তু বলছে প্রকারান্তরে, প্রকারান্তরে ঐ যে 'নাই',এরই যে একটা কথা, কিছুই নার যে একটি ভাষা যেমনি তেমনি খেলে যাচ্ছে, এই অভাবটি হতে কেউ রেহাই পাচ্ছে না—এখন জোর করে যে যে ভাবেই রেখে দেক না কেন, দর্শন এখানেই খেলে গেছে। তাই সমস্ত মতগুলোকে ভাল করে দেখে নিরপেক্ষভাবে প্রতিটিকে বিচার করে দেখলে কার কি কোথায়, কোন অবস্থা হতে কি বলেছেন সবগুলো বের হয়ে যাবে। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কাউকে নিয়ে ব্যক্তি ও ব্যক্তির মতকে নিয়ে ভাল মন্দ বলাবলি আমি নিজে পছন্দ করি না---নিজের সম্পর্কে জানতে চাওয়ার জন্যই মাত্র একটুখানি বলা হল---তার সাথে যা যা আসছে তাই বলা হল।"